ইতিহাস জানা যায় কীভাবে?

তোমাদের একটা ছোট গল্প বলি। শোনো। সজীব, রত্না, সালমা, শাকিল, মাইকেল ও মনীষা একসঙ্গে একদিন বল খেলছিল মাঠে। মাঠের পাশেই জঙ্গল। বল ওই জঙ্গলে হারিয়ে গেল। ওরা সবাই মিলে জঙ্গলে বল খুঁজছে তো খুঁজছেই। বলটা তো আর পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে বিকাল হয়ে গেছে। আলোও কম। হঠাৎ সালমা ও মনীষা জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা দালান দেখতে পেল। ওরা বন্ধুদের বলল, 'ওখানে গিয়ে বলটা খুঁজি। তখন শাকিল ও সজীব বলল, 'ওখানে কে না কে থাকে জানি না। যদি আমাদের মারে। আটকে রেখে দেয়। যদি ভূত থাকে!' সালমা ও মনীষার সাহস বেশি। ওরা সবাইকে জোর করে ওই ভাঙা দালানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাঙা দালানের একটা রুমে ওরা খুঁজে পেল কয়েকটা ভাঙা চেয়ার, একটা খাট, একটা ভাঙা টেবিল। ঘরের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো পুরোনো খবরের কাগজ। একটা পানি ভরা মাটির কলসি।

পাশের রুমে ঢুকে তারা অবাক। ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরা। একটা টেবিলের ওপরে রাখা কয়েকটা খাতা ও ডায়েরি। কতকগুলো তালপাতা। উপরে লেখা। ওরা লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল। দেখতে অনেকটাই বাংলা অক্ষরের মতন। কিন্তু কোথায় যেন অমিল আছে। বেশ প্যাচানো, লাল কালিতে সুন্দর করে লেখা। পাশেই রাখা কয়েকটি সাদা-কালো ফটো। তাতে কয়েকজন মানুষ একটা ভাঙাচোরা বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওই বিল্ডিংয়েরও কয়েকটা ছবি। দেয়ালে আঁকা ছবি। খোদাই করা কারুকাজ। ওরা আরও দুটো রুমে ঢুকল। সেগুলোতে ছাদ ভেঙে পড়েছে মেঝেতে। ওখানে কেউ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেক খুঁজেও ওরা বলটা পেল না, ওই ভাঙগা দালানে। কিন্তু ওরা জঙ্গলের মধ্যের ভাঙা দালান, দালানের মধ্যের জিনিসপত্র, খবরের কাগজ, ডায়েরি, ফটো, অচেনা হাতে লেখা তালপাতা, ভাঙা মাটির পাত্র নিয়ে ভাবতে থাকল। নিজেরা নিজেরা বাড়ি থেকে বের হয়ে জঙ্গলের পথে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। 'কে থাকে ওই ভাঙা, জঙ্গলের মধ্যে দালানে?' 'কেন ওখানে তিনি একা একা থাকেন?' পুরোনো খবরের কাগজ, অচেনা হাতে লেখা ডায়েরি ও তালপাতায় কী লেখা আছে?' 'মাটির পাত্রের টুকরাগুলো তিনি কেন জমা করেছেন?' 'ফটোর লোকগুলো কারা?' 'ফটোর ওই দালানটি কোথায়?' 'ওই পুরানো লেখা, ফটো, মাটির পাত্রর টুকরা কত পুরানো?' 'কারা তালপাতায় লিখত?' 'তখন কি কাগজ ছিল না?' 'বাংলা অক্ষরের মতন?'

লেখা ভাষা পড়া যাবে কী করে?' 'ওই পুরোনো দালানে টেবিল, চেয়ার ও খাট কোথা থেকে এলো?' 'এই দালানটি যখন একদম নতুন ছিল, তখন কেমন ছিল?' 'কারা সেখানে থাকতেন?' 'তারা কোথায় গেলেন?' 'কেন চলে গেলেন?' 'তখনও কি এই জঙ্গল ছিল'– এমন হাজারটা প্রশ্ন ওদের সবার মাথায় কিলবিল করতে থাকল। পরে ওরা ঠিক করল স্কুলের এনায়েত স্যার আর অনিতা ম্যাডামকে সবকিছু খুলে বলবে। তারা অনেক কিছু জানেন। নিশ্চয়ই এই ভাঙা দালান আর দালানের জিনিসপত্র সম্পর্কে তারা অনেক কিছু বলতে পারবেন। পরের দিন স্কুলে যাওয়ার পরে অফ পিরিয়ডে ওরা সবাই স্যার আর ম্যাডামের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলল। স্যার ও ম্যাডাম তো ওদের সাহস ও বুদ্ধি দেখে খুব অবাক। তারা ওদের সবাইকে বললেন, 'তোমরা তো বিরাট আবিষ্কার করেছ। আমরাও তো জানি না যে জঙ্গলের মধ্যে কোনো ইতিহাস লুকিয়ে আছে। ওই দালানে যিনি থাকেন তিনি নিশ্চয়ই হয় পুরোনো ইতিহাস নিয়ে বা প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি বাংলা ছাড়াও আরও ভাষা পড়তে পারেন। পুরোনো এই তাল পাতার লেখা, মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরা, পুরোনো দালানের ফটো থেকে তিনি পুরোনো সময়ের বিভিন্ন ঘটনা জানার চেষ্টা করেন। একদিন তোমাদের সঙ্গে আমরাও যাবো ওই ভাঙা দালানে।

ইতিহাসের উৎস, উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

তোমরা মনে করতে পারো, ইতিহাস একটি কঠিন বিষয়। ইতিহাস জানার জন্য অনেক কিছু জানা লাগে। উপরের গল্পটি পড়ে কী শিখলে? আসলে কিন্তু ইতিহাস জানা ততটা কঠিন ও জটিল না। আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে আছে অনেক উপাদান, মানুষ বা বস্তু। এগুলোই যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলেই আমরা এগুলোর অতীত নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারব। পুরোনো জিনিসপত্র, পুরোনো দলিলপত্র, খবরের কাগজ, চিঠিপত্র, ম্যাগাজিন, বইপত্র, দোকানের হিসাবের খাতা, তোমার বাসার দলিল, মা-বাবার ডায়েরি, নানার চশমা বা ঘড়ি বা হাঁটার লাঠি। চারদিকে, ঘরের মধ্যে ও বাইরে। ছড়িয়ে আছে নানান কিছু। অতীতে কী ঘটেছিল, কখন ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল ও কীভাবে ঘটেছিল তা জানতে, বুঝতে আর ব্যাখ্যা করতে এসব জিনিসপত্র কাজে লাগতে পারে। তোমার মা-বাবার সঙ্গে তাদের ছোটবেলার কথা, পড়াশুনার কথা, আশপাশের লোকজনের কথা জিজ্ঞেস করো। তাদের গল্প শুনতে চাও। সেই গল্পও হতে পারে ইতিহাস। তোমার আশপাশের কোনো মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কথা বলো। তিনি তোমাদের বলবেন মুক্তিযুদ্ধের গল্প। পাশের খালাম্মা বা দাদিজানের কাছে জানতে চাও মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কথা। তারাও তোমাকে যে গল্প বা কাহিনি বলবেন, তা-ও একধরনের ইতিহাস।

ইতিহাসে তিনটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা হলো সময়। আরেকটা হলো স্থান। তৃতীয়টি হলো যাদের ইতিহাস জানতে চাচ্ছ তারা। তারা মানুষ হতে পারে। নদী হতে পারে। মাটি হতে পারে। পরিবেশ হতে পারে। যেকোনো প্রাণী বা গাছপালাও হতে পারে। তোমার পাশে যে বড় গাছটি আছে, সেই গাছটি ছোট থেকে বড় হয়েছে। সেই গাছটি তার চারপাশে নানা ঘটনা ঘটতে দেখেছে। সমস্যা হলো, গাছটি আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না। তোমার পাশের পুকুর বা বিলটি। তোমার পাশের নদীটি। সেগুলোও কতকাল আগে থেকে কতকিছু দেখেছে। নিজেরা বদলে গেছে। কখনো পানি থাকে। কখনো পানি থাকে না। কত প্রাণী, উদ্ভিদ, মাছ, পোকামাকড়, সাপ এখানে একসময় ছিল। সেগুলো হয়তো মরে গেছে। নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। মুশকিল হলো, এসব প্রাণীর কোনোটি আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না। তাই যারা আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না তাদের ভাষা আমরা শিখতে পারি। তাদের জানার উপায় আমরা খুঁজতে পারি। তাদের অতীত কেমন ছিল তা-ও জানার চেষ্টা করতে পারি। সেই অতীত কাহিনিগুলোই হবে ইতিহাস।

ইতিহাস হতে পারে কোনো একটি জেলার ইতিহাস, একটি বিভাগের ইতিহাস, একটি দেশের ইতিহাস, একটি অঞ্চলের ইতিহাস, কোনো ভূপ্রাকৃতিক ভাবে ভিন্ন স্থানের ইতিহাস। বিভিন্ন স্থানের আজকে (বর্তমানে) যে নাম ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, অতীতে সেই নাম ও বৈশিষ্ট্য না-ও থাকতে পারে। আজ যেসব মানুষ একটা জায়গায় বসবাস করে অতীতে তারা সেখানে থাকতে পারে। হয়তো তাদের বাবা, মা, দাদু বা নানা সেখানে বসবাস করতেন। হয়তো ৫০ বা ১০০ বছর আগে তাদের বাবা, মা, নানা ও দাদা সেখানে বসবাস করতেন।

তাহলে ইতিহাস প্রধানত অতীত কালের বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা, মানুষজন, পরিবেশ, গাছপালা নিয়ে আলাপ করে। কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গার অতীতের ঘটনা নিয়ে, অতীতের ঘটনা ঘটার কারণ নিয়ে বর্ণনা জানতে ও লিখতে পারে। সেই লেখা হবে ইতিহাস। তবে সেই অতীত কালের ঘটনাগুলো, সেগুলোর বর্ণনা, সেগুলো ঘটার কারণ খোঁজার কাজটা কিন্তু ধাপে ধাপে করতে হয়। কোনো বিষয়ের ইতিহাস বা কার ইতিহাস আমরা জানার ও লেখার জন্য বেঁছে নিয়েছি তা-ও জানার পদ্ধতি ঠিক করে দেয়। আবার ঘটনার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আলোচনা ও লেখার ক্ষেত্রে একটা শুরু ও শেষ থাকতে হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বা হঠাৎ করেই কোনো কারণে

কীভাবে সেই ঘটনাগুলো ঘটল বা ঘটা বন্ধ হলো। কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল তা জানতে, বুঝতে ও লিখতে হয়। এভাবে অতীতের নানা সময়ের ইতিহাস জানার জন্য সময়ের একটা ধারাবাহিক রূপরেখা ব্যবহার করা হয়। এই রূপরেখাকে বলে কালানুক্রম বা সময়ের অনুক্রম। ১০০ বছর আগে, ২০০ বছর আগে, ৫০০ বছর আগে,

এক হাজার বছর আগে, দশ হাজার বছর আগে, এক লক্ষ বছর আগে– বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস জানাই সময়ের অনুক্রমের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস জানা। ইতিহাসে এই কালানুক্রম বোঝার জন্য অতীতের বিভিন্ন সালকে আমাদের পরিচিত ক্যালেন্ডারের সাল ও তারিখ অনুসারে বিভিন্ন যুগে ভাগ করা হয়। সেই ক্যালেন্ডার হতে পারে গ্রেগরিয়ান বা খ্রিষ্টীয় অথবা বাংলা সাল বা হিজরি সাল। এখন যেমন ২০২২ সাল (ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে), আবার এই সাল একবিংশ (২১শ শতক)। আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। সেটা ছিল বিংশ শতক (২০শ শতক বা শতাব্দী)। দশ বছরকে বলে দশক। পঞ্চাশ বছরকে বলে অর্ধ-শতক। প্রতি একশ বছরকে বলে শতক বা শতাব্দি। প্রতি হাজার বছরকে বলে সহস্রাব্দ। অনেক আগের ইতিহাস জানতে হলে হয়তো আমাদের কয়েক লক্ষ বা কয়েক মিলিয়ন বছরের ইতিহাসও জানতে হয়। কিছু দিন আগে পর্যন্তও যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পরের সময়কে ইংরেজি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে বলা হতো খ্রিষ্টাব্দ আর জন্মের আগের সময়কে বলা হতো খ্রিষ্টপূর্বাব্দ বা খ্রিস্টপূর্ব সময়। ধরো বাংলাদেশের বগুড়ায় মহাস্থানগড় নামের যে পুরোনো ঐতিহাসিক স্থানটি রয়েছে সেখানে মানুষ প্রথম বসতি তৈরি করেছিল খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকে। এখন (বর্তমানকাল) থেকে হিসাব করলে সেই বসতি প্রায় ২৩০০-২৪০০ বছরের পুরনো। এখন খ্রিষ্টাব্দ বা খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের পরিবর্তে সাধারণ অব্দ বা সাধারণ পূর্বাব্দ বলা হয়ে থাকে সময় গণনায়। সাধারণ অব্দ গণনার যে ক্যালেন্ডার, তার শুরুও যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পর থেকে। আর সাধারণ পূর্বাব্দ তাঁর জন্মের আগের। এই ক্যালেন্ডার পৃথিবীর সব দেশেই অনুসরণ করা হয়। কারণ, অনেক সময় একেক দেশে একেক ক্যালেন্ডার থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সময় গণনা করলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমস্যা হতে পারে।

যেমন ব্রিটিশরা আমাদের দেশ দখল করে যখন শাসন করেছিল, তার শুরু হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধে। সে সময়ে

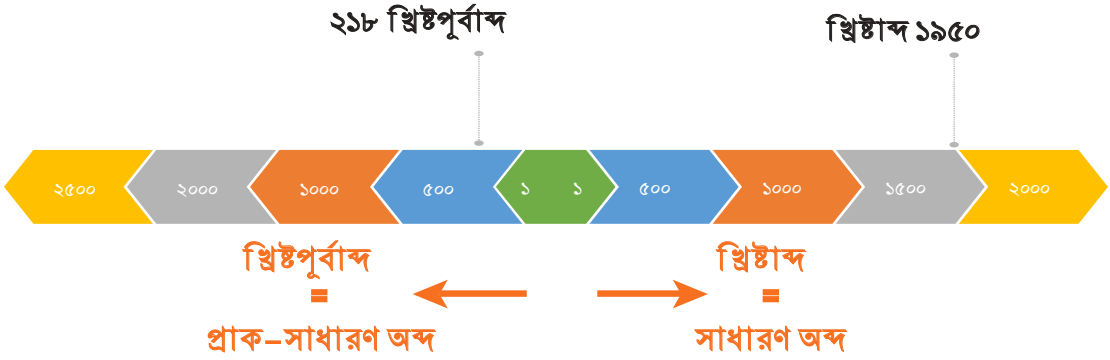

কিন্তু বাংলাদেশ নামে কোনো আলাদা দেশ ছিল না। তখন বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত, ও পাকিস্তান মিলে ছিল ভারতবর্ষ বা ভারত উপমহাদেশ। মোগল সম্রাট বা শাসকগণ ছিলেন ক্ষমতায়। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা আর বিহার শাসনের জন্য মোগল সম্রাট নিয়োগ করেছিলেন যাকে, তিনি নবাব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বাংলার নবাব ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলা। তাকে সেই সময়ের ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামের একটা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা অন্যায়ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে হারিয়েছিল। সেই যুদ্ধ ঘটেছিল পলাশী নামের একটা জায়গায়। সেই জায়গাটি এখনকার ভারতের পশ্চিমবাংলার নদীয়া জেলায় অবস্থিত। তখন তাহলে ছিল অষ্টাদশ (১৮শ শতক)। সেই যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে সেই সময়ের বাংলা (আজকের বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বাংলা মিলে ছিল বাংলা), বিহার ও উড়িষ্যা দখল করে নিজেদের পছন্দের একজনকে নবাব বানিয়ে দিয়েছিল। তারপরে কয়েক বছরের মধ্যে পুরো ভারত উপমহাদেশ তারা দখল করে নিল। পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো। সেই সাম্রাজের পতন হলো ১৯৪৭ সালে যখন ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো আলাদা দেশ তৈরি হলো। বাংলাদেশ তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশের নাম তখন হলো পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানি শাসকেরা ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপরে নানা অত্যাচার, অবিচার আর নিয়ন্ত্রণ শুরু করলে সেই শাসনের শেষ হলো ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

স্থান ও কালের ভিন্নতা এবং ইতিহাসের ভিন্নতা : দেশ, কাল ও যুগ

ওপর বিভিন্ন সাল ধরে যে বর্ণনা তোমরা পড়লে, তার ওপর ভিত্তি করে যদি আমরা যুগকে ভাগ করতে চাই, কীভাবে করতে পারি? সময়ের অনুক্রম ধরে। আমরা ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কে বলতে পারি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ (কারণ, আমাদের দেশ বাইরের একটা দেশ দখল করে শাসন করে বলে আমাদের দেশ সেই দেশের উপনিবেশ ছিল)। কেউ কেউ এই যুগকে বলেন আধুনিক যুগ। তারা মনে করেন, ব্রিটিশরা উপনিবেশ তৈরি করে বেশ কিছু আধুনিক (ভালো অর্থে নয়) ধারণা ও চর্চা আমাদের মধ্যে প্রচলিত করেছিল। আবার এই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ ছিল অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ছিল পাকিস্তান আমল বা পরাধীনতার যুগ। পাকিস্তানিরাও আমাদের দেশের ছিল না। তাই এই যুগকে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক যুগও বলা হয়। ১৯৭১ সাল মুক্তিযুদ্ধের সাল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে আজ অব্দি স্বাধীন বাংলাদেশ আমল বা স্বাধীনতার যুগ। উপনিবেশ বিলুপ্ত হওয়ার কারণে কেউ কেউ ১৯৪৭ সালের পর থেকে আজ অব্দি সময়কে বলেন উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগ বা আমল বা ব্রিটিশ উপনিবেশ পরবর্তী যুগ।

এবার মজার একটি খেলা!

উপরের বর্ণনায় সময় বিষয়ক অনেকগুলো ধারণা আলোচিত হয়েছে। যেমন দশক, যুগ, কাল, শতাব্দী, সহস্রাব্দ প্রভৃতি। তোমার পক্ষে যতগুলো সম্ভব অর্থসহ শব্দগুলো নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করো। এবার তোমার আশপাশে বন্ধু, সহপাঠী, সমবয়সী বা বড় ভাই-বোন, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন যাদের সঙ্গে সম্ভব, তাদের সবার সঙ্গে এগুলো নিয়ে ধাঁধাঁ বা কুইজ প্রতিযোগিতা করতে পারো। নিচে দেখানো ছকের মতো একটি ছক করে নিতে পারো যতোগুলো ঘর প্রয়োজন ততোগুলো ঘর দিয়ে বা নিজের মতো করে অন্য কোনো ছকও করতে পারো।

ক্রম	সময় বিষয়ক শব্দ/ধারণা	শব্দ বা ধারণার ব্যাখ্যা
১.	দশক	১০ বছর সময়
২.	যুগ	
৩.	শতক	
৪.	সাধারণ পূর্বাব্দ	
৫.	----	

পৃথিবীর ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান

ত্রিমাত্রিক চিত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান

বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ভূমির বৈশিষ্ট্য এই চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখানে তোমার বাড়ি ও স্কুল কোন ভূমিরূপের উপরে অবস্থিত? এই চিত্র দেখে তোমাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে? তোমার বাসার কাছের নদীর নাম জানো?

লক্ষ করে দেখো স্থান বা দেশের নাম ও সীমানা একেক যুগে একেক রকম ছিল। ব্রিটিশরা দখল করে নেওয়ার আগে ছিল মোগল আমল বা মোগল যুগ। তখন আজকের বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান ও পাকিস্তান ছিল মোগল রাষ্ট্র অথবা একটা দেশ বা একটা রাজ্য নামে পরিচিত অঞ্চল। বাংলা ছিল সেই দেশের একটা প্রদেশ (তখনকার নাম ছিল সুবা)। ব্রিটিশরা উপনিবেশ তৈরি করার পরে তারা ওই উপনিবেশকে নাম দিল ভারত বা ইন্ডিয়া। শ্রীলঙ্কা দেশটি এবং বর্তমান মিয়ানমারের কিছু অংশও সেই উপনিবেশ দেশের মধ্যে ছিল। ইউরোপ বা আমেরিকায়; কিন্তু বাংলাদেশের পরিচয় তখন ব্রিটেন। কারণ, ব্রিটেনের রাজা বা রানি এই দেশের প্রধান ছিলেন।

ব্রিটিশরা নিজেদের দেশের মতন নতুন নতুন আইনকানুন, বিচারব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রাব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করল। ১৯৪৭ সালের পরে দুটি দেশ হলো— ভারত ও পাকিস্তান। আমাদের দেশের নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ সালের পরে আমরা পেলাম স্বাধীনতা। আমাদের দেশের নাম হলো বাংলাদেশ।

তাহলে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে একটা স্থান বা দেশই বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে পারে। তার সীমানা পাল্টাতে পারে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানের নাম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। নিচে ইতিহাসে প্রচলিত কয়েকটি যুগ ও সময়কাল উল্লেখ করা হলো। মনে রাখবে অনেক কাল বা সময় যুগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শুরু ও শেষ হয়।

এই ইতিহাস জানার জন্য যারা ইতিহাস বলেন ও লেখেন, তারা বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহার করেন। এসব উপাদানের মধ্যে রয়েছে আগের দিনের লেখা বই, দলিল, নথিপত্র। বিভিন্ন ধরনের বস্তু। বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের উপাদান। আবার মানুষ লেখা আবিষ্কার করার আগের সময়ের জন্য ইতিহাসবিদগণ ওই সময়ের মানুষের তৈরি বা ব্যবহার করা পাথর, লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ, হাড় ও কাঠের তৈরি বস্তুর সাহায্য নেন। মানুষ যখন গুহায় থাকতো, শিকার ও সংগ্রহ করতো, এক জায়গায় বসবাস করতো না। ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গা

থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতো, শিকার করতো, তখনকার যুগকে বলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ। শব্দটি এসেছে প্রাক্ ও ইতিহাস থেকে। ইতিহাসে যেহেতু একসময় পর্যন্ত মানুষের লেখা বিভিন্ন ধরনের নথি বা বই বা তামার পাত বা পাথরের টুকরা বা মাটির খণ্ডকেই একমাত্র ইতিহাস জানার উৎস বলে মনে করা হতো, তাই ইতিহাসের আগের যুগকে প্রাক-ইতিহাস বা প্রাগিতিহাস নামে ডাকা শুরু হয়। এই সময়ের শুরু তিন বা তারও বেশি মিলিয়ন বছর আগে। আর যখন মানুষ লিখতে শুরু করলো, তখন শুরু হলো ইতিহাস। যেমন মিসরীয় সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতার মানুষজন লিখতে জানতো। তাদের লেখার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। সময়ের শুরু ও শেষও ভিন্ন ভিন্ন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগকে আবার কয়েকটি যুগে ভাগ করা হয়– প্রধানত মানুষের তৈরি ও ব্যবহার করা বিভিন্ন নিদর্শনের কাঁচামালের উপরে ভিত্তি করে। একটা দীর্ঘ সময় মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পাথরের, জীবাশ্মের বা হাড়ের হাতিয়ার ব্যবহার করেছে শিকার করার জন্য। মাছ ধরার জন্য। শিকার করা প্রাণীর শরীর থেকে মাংস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার জন্য। বিভিন্ন জায়গার পরিবেশ, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, বরফের প্রভাবে মানুষের এসব হাতিয়ারেও পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ তার নড়াচড়ায় কাছাকাছি যেসব উপযুক্ত উপাদান বা কাঁচামাল পেয়েছে, তা দিয়েই হাতিয়ার তৈরি করছিল। প্রধান উপাদান ছিল বিভিন্ন ধরনের পাথর। তাই প্রাগিতিহাসের শুরুর যুগকে বলা হয় প্রস্তর যুগ। তারপরে মানুষ তামা ও পাথর ব্যবহার করেছে। সেই যুগকে বলা হয় তাম্রপ্রস্তর যুগ। সেই যুগের পরে মানুষ পৃথিবীর কিছু জায়গায় সভ্যতা তৈরি করেছে। তখন মানুষ ব্যবহার করতে শিখেছে ব্রোঞ্জ ধাতুটি। শহর তৈরি করতে শিখেছে। লিখতে শিখেছে। পরিকল্পনা করে জমির পরিমাপ করতে শিখেছে। বড় বড় স্থাপনা নির্মাণ করতে শিখেছে। সমুদ্রপথে জাহাজে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে শিখেছে। এই যুগকে তাই কোনো কোনো অঞ্চলের ক্ষেত্রে সভ্যতার যুগও বলা হয়। ধরো বর্তমান মিসরে কিংবা বর্তমান ইরান-ইরাকে বা বর্তমান পাকিস্তানের কিছু অংশ ও ভারতের পশ্চিমের কিছু অংশে যখন সভ্যতা তৈরি হচ্ছে, তখন কিন্তু অন্য কোনো অঞ্চলের মানুষ বসবাস করছে। অথবা তাম্রপ্রস্তর যুগে বসবাস করছে। কারণ, পৃথিবীর একেক জায়গায় মানুষ একেকভাবে নিজের, সমাজের ও প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাই সকল জায়গার ইতিহাসও একরকম নয়। ইতিহাস জানার উপাদান ও যুগও এক নয়। প্রস্তর যুগকেও আবার তিনটি পর্ব বা যুগে ভাগ করা হয়। পাথরের হাতিয়ারের মাপ, ধরন ও প্রকারের উপরে ভিত্তি করে। মানুষের বেঁচে থাকার, খাদ্যাভ্যাসের, জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে। এই তিনটি যুগ হলো–উচ্চ পুরোপলীয় যুগ (বা প্রত্নপ্রস্তর যুগ), মধ্য পুরোপলীয় যুগ আর নিম্ন পুরোপলীয় যুগ। পলীয় শব্দটা এসেছে পাথর থেকে। পুরোপলীয় যুগের পরে আসে মধ্যপলীয় যুগ। পরের নব্যপলীয় যুগে মানুষ প্রথম স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে, কৃষিকাজ ব্যাপকভাবে শুরু করে আর বহু জায়গায় পশুপালন করতে শেখে।

নব্যপলীয় যুগের পরেই মানুষ প্রথম ধাতুর ব্যবহার শেখে, তখন তামার ব্যবহার শুরু করে হাতিয়ার তৈরিতে। পাথরের ব্যবহারও চলতে থাকে। তাই এই যুগকে বলে তাম্রপ্রস্তর যুগ। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যেসব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার প্রথম আদি পর্যায় শুরু হয় তাম্রপ্রস্তর যুগের শেষে; আর পুরোপুরি সেসব স্থানে নগর কেন্দ্রভিত্তিক সভ্যতা গড়ে ওঠে ব্রোঞ্জযুগে।

তারপরে মানুষ ধীরে ধীরে অন্যান্য ধাতুর ব্যবহারও শুরু করে। এসব ধাতুর মধ্যে লোহার ব্যবহার করতে শেখাটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান ভারত উপমহাদেশে ১২০০-১০০০ পূর্বাব্দে মানুষ লোহার ব্যবহার করতে শেখে। কেউ কেউ এই যুগকে লৌহ যুগও বলে থাকেন।এই লৌহযুগেই বিভিন্ন স্থানে লিখিত বিভিন্ন উপাদান পাওয়া শুরু হয়। পাথরে, গুহায়, তামার পাতে যেমন লেখা শুরু করে মানুষ, তেমনি তালপাতা বা কাপড়েও লেখা শুরু করে। কাগজ তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ভারত উপমহাদেশে প্রাগিতিহাস পার হয়ে ইতিহাসের যুগের শুরু হয়। ষষ্ঠ সাধারণ পূর্বাব্দে ঐতিহাসিক যুগ শুরু হয় বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন। এই ইতিহাসের যুগকে কেউ কেউ সেই সময়ের রাজা বা শাসকদের বংশের নামে ডাকেন। কেউ বলেন, রাজাদের বংশের নামে যুগের

নাম না হয়ে এমন কোনো নাম হোক, যা সকল মানুষের ইতিহাসের কথা বলবে। তাই মৌর্য বংশের নামে মৌর্য যুগ, গুপ্ত রাজবংশের নামে গুপ্ত যুগ, পাল রাজবংশের নামে পাল যুগ, সুলতানদের শাসনকালকে সুলতানী যুগ, মোগল রাজবংশের শাসনামলকে মোগল যুগ ডাকা হয়। আবার অন্যরা প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও ব্রিটিশ যুগ বা আধুনিক যুগ বলে থাকেন। বাংলাদেশের ইতিহাস লেখায় প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক বা ব্রিটিশ যুগ বলা হয় একদিকে; আবার, পাল আমল বা যুগ, সুলতানী আমল বা যুগ বা মোগল আমল বা যুগও বলা হয়। সাধারণ পূর্বাব্দ ষষ্ঠ শতক থেকে শুরু করে সাধারণ ত্রয়োদশ বা ১৩শ শতক অব্দি প্রাচীন যুগ বলে ধরা হয়। আবার ১৩ শতক থেকে ১৮ বা অষ্টাদশ শতক অব্দি মধ্য যুগ বিবেচনা করা হয়। মনে রাখবে, যেকোনো যুগের শুরু ও শেষ কিন্তু সব স্থানে এক নয়। ইতিহাস যারা জানার চেষ্টা করেন তারা নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যুগের শুরু ও শেষও নতুন করে চিন্তা করার কথা বলেন। অন্য সকল বিষয়ের মতন ইতিহাস লেখাও বদলাতে থাকে। নতুন নতুন তথ্য, দলিল বা নিদর্শন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কিছু জানা পুরোনো জানা অনেক কিছুকে ভুল প্রমাণ করে।

তবে ক্যালেন্ডারের বা কালপঞ্জির এই ভিন্নতা কিন্তু অতীতেও ছিল অন্যভাবে। ভারত উপমহাদেশে একেক জায়গায় একেক সময় এক এক ধরনের ক্যালেন্ডার বা বছর গণনার রীতি চালু করা হয়েছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শাসকদের নামে বছর গণনার রীতি প্রচলন করার প্রচেষ্টা ছিল। এই রীতি কোনো শাসকের মৃত্যুর পরে বা রাজবংশের পতন ঘটলে অচল হয়ে পড়ত। কিন্তু অনেক নথি ও লিখিত উৎসে এমন বছর গণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা অঞ্চলেই শকাব্দ, গুপ্তাব্দ, বিক্রমাব্দ, মল্লাব্দ ইত্যাদি। তারপরে মুসলমান, বৌদ্ধ আর হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আলাদা আলাদা দিনপঞ্জি রয়েছে। এক ধরনের দিনপঞ্জিকে পঞ্জিকা বলা হয়ে থাকে। তোমরা একটু খোঁজ করলেই পঞ্জিকা দেখতে পাবে। সেখানে সময় গণণার রীতি কিন্তু আমাদের ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ডের থেকে আলাদা।

চলো টাইম লাইন তৈরি করি

উপরে আমরা যে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের টাইম লাইন দেখলাম, চলো আমরাও আশেপাশের বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমাদের পরিবারের বা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা অতীত ইতিহাস জেনে নিজেদের মতো করে আমাদের পরিবার বা এলাকার ইতিহাসের বা পরিবর্তনের একটি টাইম লাইন তৈরি করি।

মরুভূমি

আমরা তো জানলাম, প্রাচীন মানুষেরা মরুভূমিসহ বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করত। কিন্তু মরুভূমি আসলে কী, দেখতেই বা কেমন? তা কি আমরা জানি? আমরা অনেকেই হয়তো মরুভূমির কথা আগেও জেনেছি, অনেকে হয়েতো এই প্রথম শুনলাম। মরুভূমি নাম শুনলেই চোখের সামনে আসে শুধু ধু ধু বালির প্রান্তর তাই না! তবে শুধু বালি নয় পাহাড়, মালভূমি, বালি, অনুর্বর ভূমি প্রভৃতিই হলো মরুভূমি গঠনের মূল উপাদান। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা আরোও আছে কালাহারি, অ্যারিজোনা ও আরব দেশগুলোর মরুভূমি। পৃথিবীর এই ভূমিরূপের সৃষ্টিও হয় এক বিস্ময়করভাবে। সাধারনত বেশি দেখা যায় ক্রান্তি অঞ্চলে

মরুভূমি বসবাসের জন্য অত্যন্ত অনুপযোগী। মরুভূমির দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি হয়। দিনে তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায় রাতে সেই তাপমাত্রা অনেক কমে যায়।

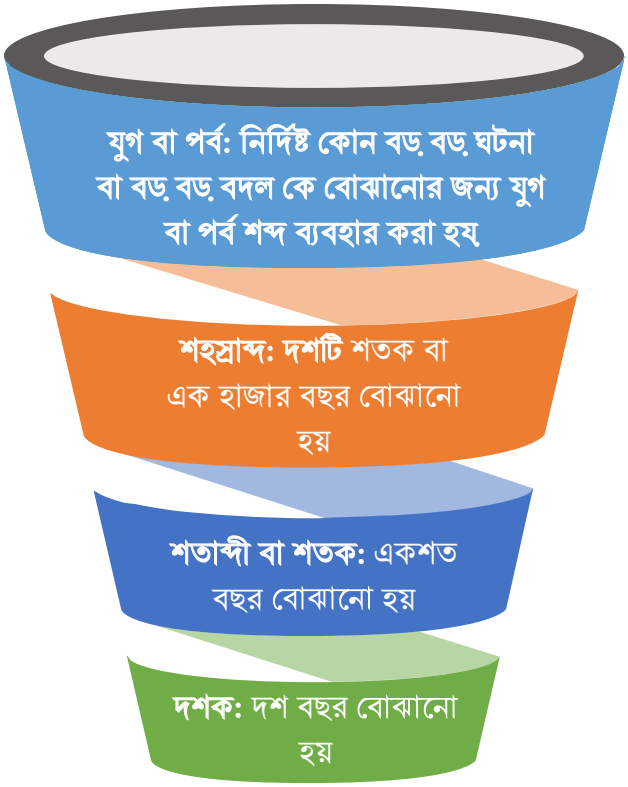

সময়ের মাপজোখ : ইতিহাসে আমরা আগে বা পরে বলতে পারি। কোনো ঘটনার আগে বা পরে বলেও আমরা সময় প্রকাশ করতে পারি। তবে ইতিহাসবিদগণ অতীত সময়কে প্রচলিত ক্যালেন্ডার অনুসারে পরিমাপ করতে গিয়ে কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করেন। কখন ঘটেছিল? – এই প্রশ্নের উত্তরের পাশাপাশি কী, কোথায়, কেন ও কীভাবে ঘটেছিল সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজাও ইতিহাসের কাজ।

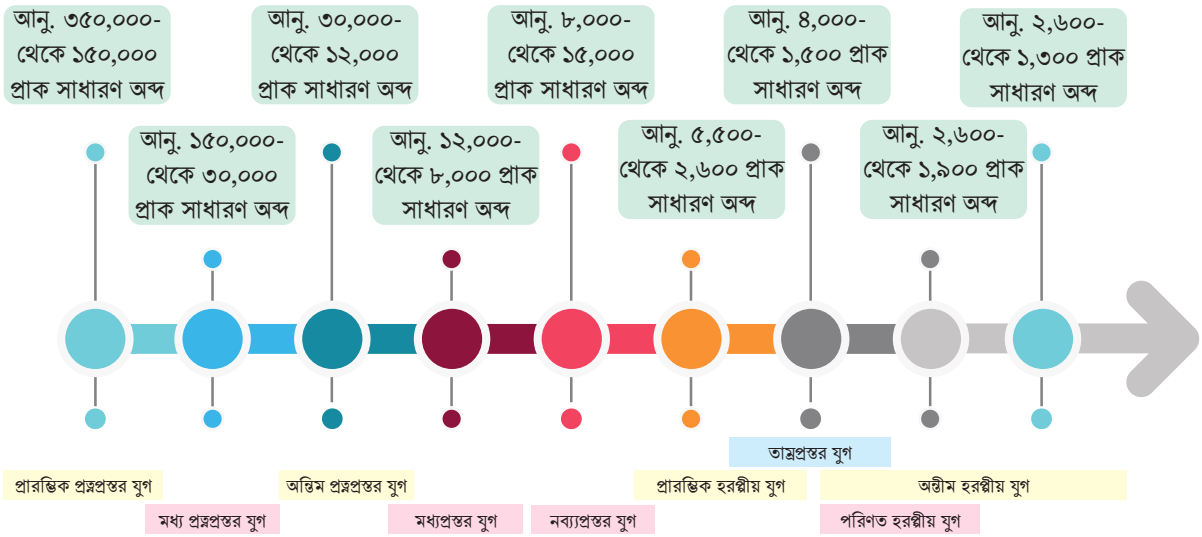

ভারত উপমহাদেশ ও বাংলাদেশের প্রাগিতিহাস ও ইতিহাসের কালানুক্রম

বিভিন্ন ধরনের উপাদান ও ইতিহাস

আগেই আমরা জেনেছি যে বিভিন্ন উপাদান ও উৎস থেকে ইতিহাস জানা যায়। ইতিহাস কেবল রাজা-বাদশাহদের জীবন কাহিনি নয়, তাদের সফলতা, যুদ্ধজয় অথবা রাজত্ব বিস্তারের বিবরণ নয়। ইতিহাস হতে পারে নানা ধরনের। কোনো ধরনের ইতিহাস জানা ও লেখা হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে কী ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। কোন কোন ধরনের উপাদান-উৎস ইতিহাস জানার জন্য ব্যবহার করা হবে। ইতিহাস জানার ও লেখার জন্য সব ধরনের পক্ষপাত থেকে দূরে থাকতে হয়। যে সকল উপাদান ও উৎস থেকে ইতিহাস জানার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। সেগুলোতে কারও কোনো পক্ষপাত বা নিজস্ব মতামত প্রকাশিত হয়েছে কি না, যাচাই করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য আর উপাদানের উপরে নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকারের ইতিহাস জানা ও লেখা যায়। যেমন :

পোড়ামাটিতে খোদাই করা লিপি। এই লিপি একটি দিনপঞ্জিও বটে। এটি প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় ব্যবহার করা হতো।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস : সমাজে মানুষ কীভাবে বসবাস করতো, তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমাজের নানা উপাদানের অতীত বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন যখন বোঝার যখন চেষ্টা করা হয় তখন সামাজিক ইতিহাস হয়ে ওঠে। একইভাবে যখন মানুষের নানান পরিচয়, গোত্র, পরিবার, গোষ্ঠী, বসবাসের এলাকা, খাদ্যাভ্যাস, জীবনাচরণ ও একদল মানুষের সঙ্গে আরেক দল মানুষের সম্পর্কের অতীত ও পরিবর্তন নিয়ে ইতিহাস জানা হয়, তখন সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখা হয়। ইতিহাস যারা জানার ও লেখার চেষ্টা করেন, তারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে অতীতকালের বিভিন্ন উৎস ও উপাদান খুঁজে বের করেন। সেগুলোর ভিত্তিতে তারা অতীতে সমাজ ও সংস্কৃতি কেমন ছিল তা জানার চেষ্টা করেন।

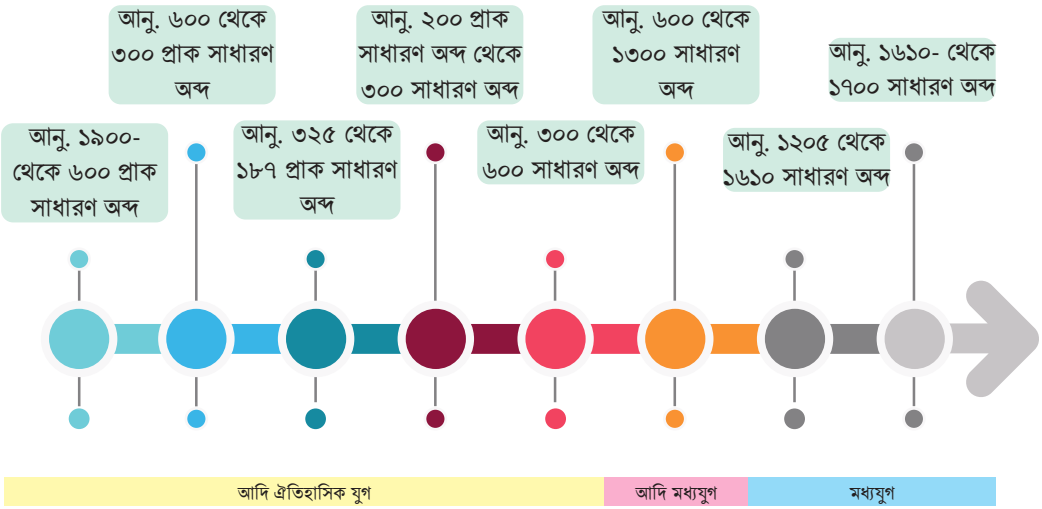

রাজনৈতিক ইতিহাস : মানুষ অতীত থেকেই যেমন একসঙ্গে বসবাস করেছে, তেমনই একে অপরের সঙ্গে বিরোধে ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। শাসকগণ একসময় রাজা, সম্রাট, বাদশাহ, মহাসামন্ত, প্রভু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তারা মানুষকে শাসন করতেন। নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করতেন। এক এলাকার মানুষের সঙ্গে অন্য আরেক এলাকার মানুষের বিরোধ ছিল। এক পরিচয়ের মানুষের সঙ্গে আরেক পরিচয়ের মানুষের যোগাযোগ ছিল। অতীতে শাসক ও শাসিতদের সম্পর্ক কেমন ছিল, রাজা ও প্রজাদের সম্পর্ক কেমন ছিল তা জানা যায় রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে। এই ইতিহাস জানা ও বোঝার জন্য পুরোনো লিখিত বিভিন্ন ধরনের উপাদান, দলিল, বিবরণীর পাশাপাশি মানুষের ব্যবহার করা বিভিন্ন নিদর্শন, স্থাপনাসহ নানা উপাদান এই ইতিহাস জানার জন্য ব্যবহার করা হয়।

তামার পাতে খোদাই করা লিপি (তাম্রলিপি বা তাম্রপট্ট)

অর্থনৈতিক ইতিহাস: মানুষ একসময় ধাতব ও কাগজের মুদ্রা ব্যবহার করতো না। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন শস্য, দ্রব্য ও জিনিসপত্র বিনিময় করতো। নানা ধরনের উপাদান মুদ্রা হিসেবে একসময় ব্যবহৃত হতো। আবার প্রজাদের কাছ থেকে রাজা বা জমিদারগণ রাজস্ব ও খাজনা আদায় করতেন। এক দেশের বা এক এলাকার সঙ্গে আরেক দেশের ও আরেক অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো স্থলপথে, জলপথে ও সমুদ্রপথে। এসব বিষয় নিয়ে যে ইতিহাসে আলাপ করা হয়, সেই ইতিহাসই অর্থনৈতিক ইতিহাস।

পাহাড়ের গুহার মধ্যের দেয়ালে খোদাই করা লিপি

পরিবেশের ইতিহাস: মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক অতীতে কেমন ছিল তা জানা ও বোঝার চেষ্টা করা হয় পরিবেশের ইতিহাসের মাধ্যমে। পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান রয়েছে। প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, মাটি, পাথর, নদী, পানি ইত্যাদি একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষ এসব উপাদানের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে, এসব উপাদান ব্যবহার করে উন্নতি করেছে। পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে, প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগতের বদলের কারণে। এসব জানাই পরিবেশের ইতিহাসের লক্ষ্য।

তালপাতায় লেখা পুরোনো চিত্রিত পাণ্ডুলিপি

কথ্য ইতিহাস : মানুষের জীবনের অনেক কথাই লিখিত হয়নি। অনেক কথা মানুষ নানা কাহিনি, কিংবদন্তি, লোক প্রবাদ, গল্প হিসেবে মনে রাখেন। এগুলো মানুষের স্মৃতিতে থাকে। ইতিহাস জানার জন্য বিভিন্ন

আবহাওয়া : কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের অর্থাৎ ১ থেকে ৭ দিনের বায়ু, তাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির গড় অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। জলবায়ু : কোনো স্থানের ৩০ বছরের বেশি সময়ের আবহাওয়া অর্থাৎ বায়ু, তাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির গড়কে জলবায়ু বলা হয়)

চকচকে প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্রের টুকরা

মানুষের সঙ্গে আলাপ করে তাদের স্মৃতি ও গল্প সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছ থেকে ওই এলাকার বিভিন্ন গল্প, কাহিনি, কিংবদন্তি, রূপকথা, প্রবাদ সংগ্রহ করা হয়। লোকমুখে শুনে শুনে, এই ধরনের কথ্য বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনি সংগ্রহ করে অতীতের এমন অনেক ইতিহাস জানা সম্ভব হয়, যা অনেক সময় লিখিত বিভিন্ন উপাদানে পাওয়া যায় না।

এমন নানা ধরনের ইতিহাসের পাশাপাশি কোনো একটি বিশেষ এলাকা বা অঞ্চলের বা দেশের ইতিহাসও লেখা হয়ে থাকে। মানুষ বিভিন্ন সময় কৃষিকাজ করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করেছে। সেই উৎপাদনের ধরন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। মানুষ পশুপালন করেছে। শিকার করেছে– এমন বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কৃষি ও শিল্পর ইতিহাস লেখা হয়ে থাকে। উৎস হিসেবে যেমন লিখিত উপাদান ব্যবহার করা হয়, তেমনই মাটির ইতিহাস, উদ্ভিদের ও প্রাণীর জীবাশ্ম, চাষাবাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তু, শিল্প উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদিত দ্রব্য অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করেন গবেষকগণ। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। অতীতকালের নানান দলিলপত্র জাদুঘর ও সংগ্রহশালা/ মহাফেজখানায় সুরক্ষিত থাকে। সেখানে গবেষকগণ দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে মানুষের, প্রকৃতির, পরিবেশের, বিজ্ঞানের ধরন অতীতে কেমন ছিল তা জানার চেষ্টা করেন।

ছোট আকারের চিত্র

পুরোনো বাংলা হরফে লেখা পুঁথি

ইটের তৈরি স্থাপত্য (মসজিদ)

অনেক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। সেগুলো খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগে। ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা হয়। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হয়। ইতিহাস জানা ও বোঝায় তাই প্রশিক্ষণ লাগে, মনোযোগ লাগে, ধৈর্য লাগে। উপাদান সংগ্রহ ও বোঝার জন্য শিখতে হয় আলাদা করে। ইতিহাস বদলাতেও থাকে নতুন নতুন তথ্য ও উপাদান আবিষ্কৃত হলে। সত্য ও প্রমাণনির্ভর ইতিহাস তাই নতুন, নতুন উপাদান ও উৎস খুঁজে পাওয়ার উপরেও নির্ভর করে।

পোড়ামাটির খেলনা

পোড়ামাটির, ধাতুর আর পুঁতি দিয়ে তৈরি অতীতের অলংকার

পাথরের গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্য

পাথরের হাতিয়ার, মুদ্রা আর মৃৎপাত্রের টুকরা

দেয়ালের গায়ে অঙ্কিত চিত্র।

পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কিত চিত্র

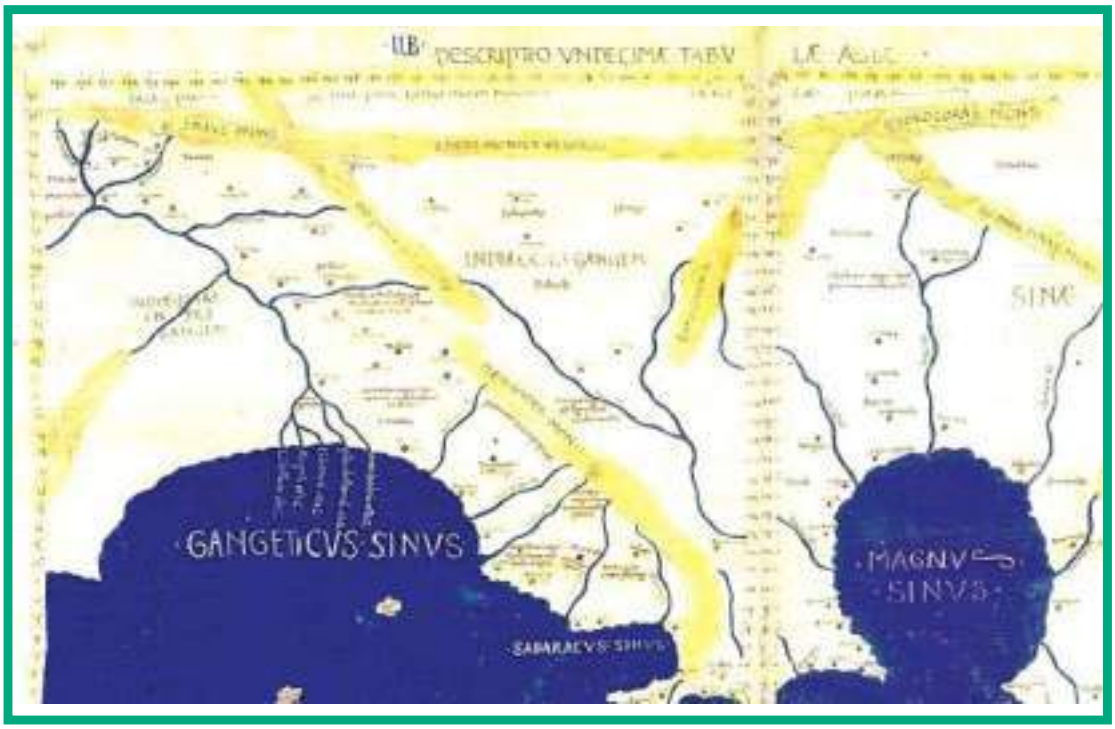

পুরোনো সময়ের মানচিত্র

মহাফেজখানায় পুরোনো দিনের ফটোগ্রাফ আর নথি নিয়ে গবেষণা করে ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা যায়।

অতীতের প্রাণীর হাড়ের জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে সে সময়ের পরিবেশ, প্রাণিজগৎ, খাদ্যাভ্যাসসহ অনেক কিছু জানা যায়।

মানুষের কঙ্কাল ও বিভিন্ন ধরনের হাড় ও দাঁতের জীবাশ্ম খনন করে খুঁজে বের করা হয়। মানুষের প্রজাতি, কবর দেওয়ার রীতি, কবরে উৎসর্গ করা বস্তু, অতীতের রোগবালাই, খাদ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্য ও বসতি সম্পর্কে জানা যায়।

পুরোনো পত্রিকা

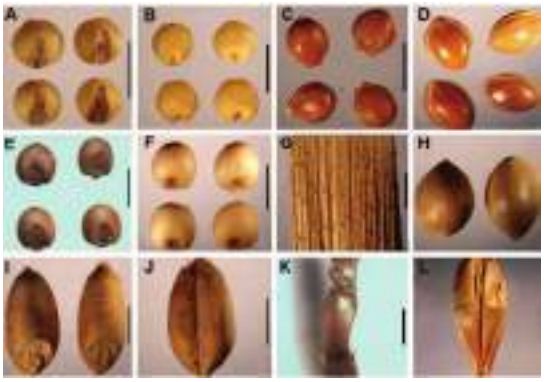

অতীতের উদ্ভিদ, বীজ, পরাগরেণুসহ বিভিন্ন ধরনের প্রমাণ খুঁজে বের করে গবেষণা করে অতীত পরিবেশ, মানুষের খাদ্যাভ্যাস, কৃষিকাজ, জীবনযাপনের ইতিহাস জানা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করে বিভিন্ন নিদর্শন খুঁজে বের করা হয়। সেগুলোর ভিত্তিতে ইতিহাস জানা যায়।

পুরোনো নথিপত্রকে ছবি তুলে মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হয় মহাফেজখানায়।

পুরোনো নথিপত্র, পাণ্ডুলিপি ও দলিল সংগ্রহ আর সংরক্ষণ করে রাখে মহাফেজখানায়

কেন ইতিহাস জানা ও লেখা দরকার?

অনেকে তোমাদের বলতে পারেন অতীতের কথা ভুলে যাও। ইতিহাস জেনে কোনো লাভ নেই। ইতিহাস জেনে টাকা-পয়সা পাওয়া যায় না। কিন্তু তারা ভুল বলবেন। ইতিহাস জানা যেকোনো মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজন। কোনো মানুষ যদি তার ও তার মতন অন্যান্য মানুষ আর প্রকৃতির ইতিহাস না জানে, তাহলে বর্তমানে সেই মানুষের বা মানুষদের কোনো নিজস্ব পরিচয় থাকবে না। আমাদের দেশ ও জাতির অতীত সম্পর্কে জানা দরকার। কারণ, একদল মানুষ মিলেমিশে কখনো বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে, কখনো মিথ্যা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে, কখনো নতুন কোনো আবিষ্কার করে এমন সব ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, যা আমাদের বর্তমানকে তৈরি করেছে। মানুষের যদি স্মৃতি না থাকে, তাহলে সেই মানুষের বেঁচে থাকা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। ইতিহাস আমাদের সকলের সমষ্টিগত স্মৃতিকে খুঁজে বের করে। আমরা অতীতে যদি কোনো ভুল করে থাকি, কোনো খারাপ কাজ করে থাকি তা জানলে ভবিষ্যতে সেই ভুল বা খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারি। আর যদি কোনো অহঙ্কার করার মতন ভালো কাজ করি, তাহলে সেই কাজের ইতিহাসে আমাদের প্রেরণা দেবে।

বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন করার পাশাপাশি সেগুলো নিয়ে গবেষণাও করা হয় জাদুঘরে।

চলো এবার আমরা কয়েকটি কাজ করি!

১. প্রথমে এখানে আমরা ইতিহাস জানার জন্য প্রচলিত ও অপ্রচলিত যে সকল উৎস ও উপাদানের কথা জানতে পারলাম তার একটি তালিকা তৈরি করি এবং বন্ধু ও আশপাশের মানুষ যারা আছে, তাদের সঙ্গে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

২. পরিবার ও আশপাশের মানুষের সহযোগিতায় ইতিহাস জানা যায় বা অতীতের তথ্য পাওয়া যায় এমন উপাদানগুলো সংগ্রহ করে স্কুলের শিক্ষকের সহযোগিতায় সকল সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে স্কুলে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারো।

৩. তোমার এলাকায় কোনো পুরোনো স্থাপনা, অতীতের ব্যবহার সামগ্রী, পোশাক, ছবি, বই, ডায়েরি, পাণ্ডুলিপি, গান, পুঁথি, সিনেমা , নাটক, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ইত্যাদি যে, কোনো কিছু ব্যবহার করে ওইসব উপাদান থেকে তথ্য নিয়ে তোমার মতো করে ঐ স্থান/বিষয়/ বা জিনিসের ইতিহাস লেখার চেষ্টা করতে পারো। এ কাজে প্রয়োজনে রিসোর্স বই, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বই, পত্র-পত্রিকা, ছবি, ইন্টারনেট, ইউটিউব থেকে বড়দের সহযোগিতায় তথ্য ব্যবহার করতে পারবে। ইতিহাস লিখে সেটা তোমার পছন্দের কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে শ্রেণি কক্ষে শিক্ষকের সহযোগিতায় উপস্থাপন করতে পারো।